কৃষি ঋণের সুদ এক অঙ্কে নিয়ে আসতে হবে

ব্যাংকিং খাতে অলসভাবে পড়ে থাকা বিপুল পরিমাণ টাকা এনজিও-এমএফআই দের মাধ্যমে কৃষিখাতে বিনিয়োগ করুন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং কৃষির গুরুত্ব আজ যেমন রয়েছে, আগামী শতাব্দিতেও অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব একইভাবে বহাল থাকবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ৬০% থাকলেও গত কয়েক বছরে শিল্প ও সেবাসহ অন্যান্য খাতের তুলনায় কৃষির অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। সর্বশেষ ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী আমদের অর্থনীতিতে (জিডিপি) কৃষির অবদান মাত্র ২০.২৯%।

এর অর্থ এই নয় যে, জিডিপি'তে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে কৃষি খাতের দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে, বরং জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি খাতের পরোক্ষ অবদান (শিল্প এবং সেবা খাতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান) অনেক বেশি। প্রান্তিক কৃষি ব্যবস্থার চর্চা করেও খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কৃষি খাতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বছরে মাত্র ৭০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন করলেও ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট খাদ্য উৎপাদন ছিল ৩৭০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন।

বাংলাদেশের দরিদ্র ও ক্রমবর্ধান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সের জনশক্তির প্রায় ৪৯% কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছে। আবার কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৬৮.১% হচ্ছে নারী।

সুতরাং বাংলাদেশে কৃষি কেবল কর্মসংস্থানের বৃহত্তম ক্ষেত্রই নয়, নারীর অংশগ্রহণ ও সামাজিক গতিশীলতারও প্রধানতম এলাকা।

কৃষি ও পল্লী ঋণ

বাংলাদেশের কৃষি মূলত ভরণপোষণের লক্ষ্যে (Subsistence ষবাবষ) পরিচালিত হওয়ায় কৃষি ঋণ একটি ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পলস্নী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে সম্প্রতি বেসরকারী ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পাশাপাশি, কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে এর কলেবর আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ও নীতিমালায় নানা বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে (২০১৩-১৪) কৃষি ও পল্লী ঋণ

গত ২২ জুলাই ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর জনাব আতিউর রহমান ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য ১৪ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের কথা ঘোষণা করেছেন।

উপকূলীয় মৎস্য চাষ, কৃষি পণ্য সংরক্ষণও বিপণন, জৈব সার উৎপাদন এবং পরিবেশ-বান্ধব কৃষি উদ্যোগের মতো কিছু খাতও নতুনভাবে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। নতুন খাত যুক্ত হলেও কৃষির মূল খাত শস্য, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ- এই তিন খাতে ঋণ বিতরণ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এ বছর অপোক্ষকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায়, বিশেষ করে চর, হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

চলতি অর্থবছরের কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা সদ্যবিদায়ী (২০১২-১৩) অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩.২৯% বেশি। গত অর্থবছরে ১৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্য থাকলেও ১০৪% অর্থাৎ মোট ১৪ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে কৃষি ও পল্লী ঋণ

২০০৯-১০ অর্থবছরে ১১ হাজার ৫১ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১ হাজার ১১৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয় (৯৭%)। ২০১০-১১ অর্থবছরেও লক্ষ্যমাত্রার ৯৭% হিসেবে মোট ১২ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৯৫% হিসেবে মোট ১৩ হাজার ১৩২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত চার বছরের মধ্যে শুধু ২০১২-১৩ অর্থবছরেই লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন বেশি ছিল (১০৪%)।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও কৃষি ঋণ

স্বাধীনতার পরপরই এদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু হলেও মূলত আশির দশকের শেষ দিকে এটি অগ্রগতি লাভ করে। দেশে প্রায় দুই হাজারের মত এনজিও ক্ষদ্রিঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর লাইসেন্সপ্রাপ্ত এনজিও'র সংখ্যা মাত্র ৬৫০টি।

শুরুতে এনজিও এবং এর উপকারভোগীর সংখ্যা কম থাকলেও সময়ের বিবর্তনে এর ব্যাপ্তি ঘটেছে। বাংলাদেশে মোট প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রায় ৮১% কোনও না কোনওভাবে (আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক) Financial Inclusion এর

আওতায় এসেছে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, এক্ষেত্রে এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। শ্রীলংকার অবস্থান প্রথম। তারা বলেছে–

বাংলাদেশে প্রায় ৪০% প্রাপ্তবয়স্ক বাক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে থাকেন। ভারতে এই হার প্রায় ৩৫% এবং পাকিস্তানে ১০%।

প্রচলিত এইসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বড় অংশই এনজিও–ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO-MFI)। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গ্রাম পর্যায়ে এনজিও–ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO-MFI) এর যতগুলো শাখা রয়েছে, তার সংখ্যা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার দ্বিগুণেরও বেশি। প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মুনাফামুখী মনোভাবের কারণে দরিদ্র মানুষকে ঋণ সেবার আওতায় আনতে না পারার কারণেই মুলত বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উত্থান ঘটেছে।

এমআরএ'র তথ্য অনুযায়ী ২০১১ সালে এনজিওগুলো প্রায় ৩৯৮.৫৫ বিলিয়ন টাকা ২ কোটি ৭ লাখ দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করে। ইকোনোমিস্ট ইন্টিলিজেন্ট ইউনিটের (উওট, ২০১২) মতে, ২০১২ সালে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বৃদ্ধির হার ১৫–২০%। এনজিও–ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO-MFI) কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৮০ শতাংশই যায় কৃষি, মৎস ও প্রাণী সম্পদ খাতে।

প্রচলিত ব্যাংগুলোতে গরিব মানুষের স্বাভাবিক অভিগম্যতা না থাকার কারণে আর্থিক লেনদেনের জন্য তারা ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়। ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান বিনা জামানতে দরিদ্র মানুষকে প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ দিয়ে দারিদ্র বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্সের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত কৃষি ঋণের চেয়ে এনজিও–ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO-MFI) কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ কয়েকগুণ বেশি।

গ্রাম পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখা বা কার্যক্রম না থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে, ২০০৫ এর পর থেকে তারা এনজিও–ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের কাজ করছে। একইসাথে, এনজিওদের আর্থিক সংকটও তাদেরকে এসব বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী করছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অর্থের উৎস ও তহবিল বিন্যাস (Fund Composition)

এমআরএ' র তথ্য অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমুহ তাদের মোট তহবিলের প্রায় ১৩–২০% অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। গত চার বছরে (২০০৮–২০১১) তাদের সংগৃহীত মোট অর্থের উৎস হিবেসে ব্যাংক ঋণের অবস্থান তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে থেকেছে।

২০১১ সালে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমুহের মোট তহবিলের মধ্যে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল চতুর্থ সর্বোচ্চ, যার পরিমাণ ২৩.৫৭ বিলিয়ন টাকা। অথচ, ২০০৮ সালে এই ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯.১৩% যা ছিল এনজিওদের অন্যতম তহবিল জোগানদাতা পিকেএসএফ–এর অবদানের চেয়েও বেশি (১৮.৫০%)। কিন্তু ব্যাংক ঋণের অতিরিক্ত সুদের কারণে এই হার কমতে কমতে ২০১১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২.৮৪%।

ব্যাংক এর অলস টাকা

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ব্যাংকগুলোতে প্রায়ই বিপুল পরিমাণ টাকা অলস পড়ে থাকতে দেখা যায়। গত ১১ জুলাই ২০১৩ ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়–

৩০ মে ২০১৩ তারিখে রাষ্ট্রায়ত্ত, বেসরকারী ও বিদেশিসহ সকল ব্যাংক মিলে ৭১ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগের অভাবে অলস পড়ে ছিল। অতিরিক্ত তারল্যের হার ছিল ৫৭%, চলতি অর্থবছরে যা ছিল সর্বোচ্চ। গত অর্থবছরের শেষ ১১ মাসে বেসরকারী ব্যাংকসমুহে ৪৩ হাজার ৭৯১ কোটি টাকা অলস পড়ে আছে, যার অতিরিক্ত তারল্যের হার ৮৩%।

সুদের হার কমালে একদিকে ব্যাংকে যেমন অলস টাকা পড়ে থাকে না, তেমনি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিতে পারলে তা কৃষি ও পল্লী ঋণের মাধ্যমে কৃষকের হাতে পৌঁছে দিতে পারে, যার মাধ্যমে আরো টেকসই, দৃঢ় ও সুসংহত হতে পারে বাংলাদেশের কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

আমাদের সুপারিশ

১. কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদের হার এক অঙ্কের সংখ্যায় নামিয়ে আনতে হবে।

২. বাংলাদেশের সর্বত্র সকল পর্যায়ের কৃষকের হাতে ঋণ পৌঁছানোর লক্ষ্যে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৩. সহজ শর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে এনজিও–ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করতে হবে।

৪. প্রয়োজনে ব্যাংকের জন্য প্রযোজ¨ CSR (Corporate Social Responsibility) এর সাথে সমন্বয় করা।

যোগাযোগ
আবদুল আউয়াল (০১৭১২০০৩৭৭১) সিডিএফ, মো: আতিকুন্নবী (০১৭১৩৩৩৬৭১) ইনাফি বাংলাদেশ, রেজাউল করিম চৌধুরী (০১৭১১৫২৯৭৯২), তারিক সাইদ হারুন (০১৭১৩৩২৮৮৩৫) কোস্ট ট্রাস্ট।